OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 574 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 574 - 585
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

১৯৪৩ সাল - ‘অশনি সংকেত’ ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে মহিলাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ

ডম্বরুপাণি ভট্টাচার্য্য
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ত্রিবেণীদেবী ভালোটিয়া কলেজ, রাণীগঞ্জ
Email ID: damrupani25@gmail.com
0009-0006-7607-6505

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Scorched Earth, Ashani Sanket, Great Famine, CALL TO WOMEN.

Abstract

The study of Indian history marks a significant turning point in the 1940s. It was during this decade that women began participating directly in politics - a trend of self-identity formation that persisted into later periods. Beyond this, the 1940s witnessed several momentous events that shook every stratum of society, profoundly impacting the lives of women.

The decade began with the Second World War (1942–45), the impact of which pushed colonial nations like India toward a dire economic crisis. Concurrently, the food crisis and the Great Famine of 1943 completely destabilized the socio-economic fabric of Bengal; death and malnutrition became commonplace sights.

On one hand, the launch of the 'Quit India' movement at the call of the National Congress highlighted the role of women in the anti-imperialist struggle. On the other hand, the exigencies of the war - fueled by the collusion of black marketeers, hoarders, and the British government's callous bureaucracy - precipitated a man-made famine in Bengal in 1943 that caused immense anguish to women. Approximately six million destitute people faced this crisis. The year 1943 remains infamous in Bengal's history, marking the most devastating famine since 1757. The Second World War was raging; Japanese forces had occupied Burma (Myanmar). Just as in Singapore, the defeat of British power in Burma appeared inevitable. What if enemy troops were to invade India via Burma? Prime Minister Winston Churchill adopted a drastic strategy known as 'Scorched Earth' - aiming to thwart the enemy by destroying resources that were essential or useful to them. The British administration halted riverine transport, causing agricultural supply chains to collapse. Food grains were requisitioned from all quarters for the military. Furthermore, warehouses were confiscated to ensure that Japanese troops could not lay their hands on rice stocks. Rice imports from Burma ceased. Food prices in the market skyrocketed, and a severe food crisis gripped the rural areas. Above all, the dark clouds of famine loomed over the destiny of

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 574 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> *Bengal. Nearly five million people perished amidst the desperate cry for food; emaciated, skeletal bodies of the starving collapsed along roadsides and in open fields. It was against this harrowing backdrop of famine that Bibhutibhushan Bandyopadhyay penned Ashani Sanket (Distant Thunder), a poignant tale of rural life.*

Discussion

ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চায় ১৯৪০ এর দশক একটি পরবান্তরের সাক্ষ্য বহন করে। ১৯৪০ এর দশককেই মেয়েরা সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে, মেয়েদের আত্মপরিচয় গঠন এই ধারা পরবর্তী সময়েও আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এছাড়াও ১৯৪০-এর দশক বেশকিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনার সাক্ষ্য; যা সমাজের সর্বস্তরকে আন্দোলিত করে দিয়েছিল, মেয়েদের জীবনকে তো বটেই।

১৯৪০ এর দশক শুরুতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৪২-৪৫) ও তার প্রভাব ভারতবর্ষের মতো ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে খুবই ভয়াভয় অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। সেই সঙ্গে ১৯৪৩ এর খাদ্য সংকট, মন্বন্তর বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি একেবারে নড়িয়ে দিয়েছিল। মানুষের মৃত্যু, অপুষ্টিজনিত কারণে এটা একটা সাধারন চিত্র ছিল।

একদিকে জাতীয় কংগ্রেসের আহ্বানে ভারতছাড়ো আন্দোলন শুরু হলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই-এ নারীর ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিতে কালোবাজারি, মজুতদার এবং ব্রিটিশ সরকারের হৃদয়হীন আমলাতন্ত্রের যোগসাজশে ১৯৪৩ খ্রিঃ বাংলার বুকে নেমে আসে মনুষ্য সৃষ্ট এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ— যা নারীদের হৃদয়কে বেদনায়িত করে। প্রায় ৬০ লক্ষ দুঃস্থ নরনারী সংকটের মুখোমুখি হন। ১৯৪৩ সাল, বাংলার ইতিহাসে কুখ্যাত, ১৭৫৭'র পরে সবচেয়ে বড় মন্বন্তরের কারণে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। জাপানি সেনারা দখল করে নিয়েছে ব্রহ্মদেশ মায়ানমার। সিঙ্গাপুরের মতো মায়ানমারেও ইংরেজ শক্তির পরাজয় সুনিশ্চিত। মায়ানমার হয়ে শত্রুসেনারা যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে? প্রধানমন্ত্রী ডব্লিউ চার্চিল নিলেন এক ভয়ংকর পরিকল্পনা— স্কর্চড আর্থ (Scorched Earth), শত্রুকে ঘায়েল করতে হবে এমন সব জিনিসকে ধ্বংস করে, যা তাদের জন্য দরকারি, তাদের জন্য অপরিহার্য। ব্রিটিশ প্রশাসন নৌব্যবস্থা বন্ধ করে দিল। ভেঙে পড়ল কৃষি যোগাযোগ। সেনা সদস্যদের জন্য সকল জায়গা থেকে মজুত করা হতে থাকল খাদ্যশস্য। উপরন্তু জাপানি সৈন্যরা যাতে কোনোভাবে চালের নাগাল না পায়, সেজন্য বাজেয়াপ্ত করা হল গুদামগুলো। চাল আমদানি বন্ধ হয়ে গেলো বার্মা থেকে। খাদ্যদ্রব্যের দাম হু হু করে বাড়তে থাকলো বাজারে, গ্রামাঞ্চলে দেখা দিল নিদারুণ খাদ্যসংকট। সর্বোপরি, বাংলার ভাগ্যাকাশে দেখা দিলো দুর্ভিক্ষের ঘনঘটা। খাবারের হাহাকারে প্রাণ গেল প্রায় পঞ্চাশ লাখ মানুষের; পথে প্রান্তরে লুটিয়ে পড়তে লাগল না খেতে পাওয়া কঙ্কাল সর্বস্ব মানবদেহ। দুর্ভিক্ষের এই ভয়াল প্রেক্ষাপটে গ্রামজীবনের করুণ আখ্যান নিয়ে রচিত হয়েছিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি সংকেত'।

'অশনি সংকেত' ও বাংলার দুর্ভিক্ষের চিত্র— একথা বলাই বাহুল্য যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে একজন। বাংলাসাহিত্যে ধূমকেতুর মতো তার আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তেমন বিস্ময়কর। তার কালোত্তীর্ণ সৃষ্টি 'পথের পাঁচালী' কিংবা 'অপরাজিত' চিরায়ত বাঙালি জীবনে উপন্যাসরূপে যেন যথার্থ মহাকাব্য। তিনি যখন 'অশনি সংকেত' রচনায় হাত দেন, তখন তার বয়স প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। তখন তিনি পথের পাঁচালী, অপরাজিত এবং আরণ্যকের প্রথিতযশা সাহিত্যিক। রেডিও বক্তৃতা উপলক্ষে সেসময় বিভূতিভূষণ এসেছিলেন কলকাতায়। ঘাটশিলায় থাকার কারণে তেতাল্লিশের মন্বন্তরের মর্মান্তিক রূপ তার জানা ছিল না, কলকাতায় তার মারাত্মক রূপ দেখে তিনি মর্মাহত হন বিশেষভাবে। আপন অভিজ্ঞতায় এই মর্ম বেদনা থেকেই জন্ম হয় 'অশনি সংকেত' - এর।

উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'মাতৃভূমি' পত্রিকায়, ১৩৫০ বঙ্গাব্দের মাঘ থেকে। ১৩৫৪-তে পত্রিকাটির অবলুপ্তির সাথে সাথে 'অশনি সংকেত'-এরও প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। বিভূতিভূষণ উপন্যাসটির সম্পূর্ণ প্রকাশ দেখে যেতে পারেননি। উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে একটি প্রান্তিক গ্রাম্য পরিবারকে ঘিরে। পরিবারের কর্তা গঙ্গাচরণ কুলীন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 574 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ব্রাহ্মণ — পাড়াগাঁয়ের একমাত্র উচ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণ সন্তান। দুই সন্তান এবং স্ত্রী অনঙ্গকে নিয়ে তার বাস। সে দরিদ্র, তবে শিক্ষিত এবং একই সাথে চতুর। টোলে ছাত্র পড়িয়ে, কবিরাজি করে, যজমানের বাড়িতে পূজা করে তার আয়-রোজগার। গ্রামের সকলেই তাকে সমীহ করে চলে, যেকোনো দরকারে ব্রাহ্মণসেবা করে পুণ্য অর্জনে তারা সদা সচেষ্ট। সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা সেই অজপাড়াগাঁয় একসময় দেখা দিল দুর্যোগের করাল ছায়া। গ্রামবাসী জানল, যুদ্ধ শুরু হয়েছে। গোলাভরা ধান, নদীভরা মাছ, ক্ষেতভরা সবজি — গ্রামীণ প্রাচুর্যের ভেতর বেড়ে ওঠা গ্রামবাসী, দু'মুঠো ভাতের জন্য যে মানুষ অনাহারে মারা যেতে পারে — একথা যাদের কল্পনাতেও কখনো আসেনি, তারাই দেখল হু-হু করে বেড়ে যাচ্ছে চালের দাম।

এক মণ ধান চার টাকা থেকে লাফিয়ে হল চব্বিশ টাকা, আবার পরশুই দাঁড়ালো চল্লিশ টাকায়। শূন্য হল গুদামভরা পাহাড় সমান চালের সারি সারি বস্তা। যারা একদিন স্বপ্রণোদিত হয়ে মাছ, সবজি এনে ব্রাহ্মণকে সেবা দিত, তারাই দু'মুঠো চালের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগলো গ্রামের পর গ্রাম। গুদাম লুট, খুনোখুনি পর্যন্ত হতে লাগলো গ্রামে। গঙ্গাচরণের হাঁড়িতেও টান পড়লো— এবেলা কোনোমতে খাবার জোটে, তো ওবেলা 'আখা' (উনান) জ্বলে না। আধপেটা খেতে পাওয়াও যেন মহামূল্য বস্তু হয়ে ওঠে তাদের কাছে। উজাড় হতে লাগল গ্রামকে গ্রাম, আহারের তাড়নায় অভাবী গঙ্গাচরণের বাড়িতেই আশ্রয় নিতে লাগল ক্ষুধায় জীর্ণ-শীর্ণ পরিচিতজনেরা। পিতা-মাতার দুঃখ, আক্ষেপ আর দীর্ঘশ্বাস বাড়িয়ে এরই মধ্যে গঙ্গাচরণের স্ত্রী অনঙ্গের কোলে এলো তৃতীয় সন্তান।

গাঁয়ে দুর্ভিক্ষের দাবানলে যেদিন মতি নামের মেয়েটির চিতা প্রথম জ্বলে উঠল, সেদিন মানুষ বুঝতে পারল মূর্তিমান বিপদের সংকেত— দুর্ভিক্ষের দাবানলে ছাই হয়ে উড়ে যাওয়ার, লক্ষ মানুষের জন্য বিনাশের অশনি সংকেত। নিস্তেজ-নিস্তরঙ্গ ব্রাহ্মণ পরিবারকে রেখে জঠরজ্বালা নিবারণের নিমিত্তে অনিশ্চিতের পথে গ্রামবাসীর যাত্রার সংবাদেই শেষ হয় এ উপন্যাসের কাহিনী। দুর্ভিক্ষের দাবানলে এভাবে এক সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের বেঁচে থাকার লড়াই উপস্থাপনের মাধ্যমে বিভূতিভূষণ পাঠকদের নিয়ে গেছেন সেই কঠিন সময়ে।

আগেই বলেছি, দুর্ভিক্ষের মর্মান্তিক বিবরণই মূলত উপন্যাসটির মূল উপজীব্য। দুর্ভিক্ষ যে কতটা শক্তিশালী, কতটা অনভিপ্রেত, ক্ষুধা-তাড়না— জীবনপথে তা কত বড় পটপরিবর্তনের সূচনা করতে পারে— এই উপন্যাসে অন্তর্বেদনা, সহমর্মিতায় অথচ কঠোর বাস্তব ও একই সঙ্গে মায়ামাখানো গ্রাম বাংলার জীবনের রূপের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন বিভূতিভূষণ। সময়টা ছিল এমনি, যে অখণ্ড বাংলার মানুষের স্বপ্ন তখন অর্থ, অট্টালিকা আর প্রতিষ্ঠা নয়, শুধু দু'মুঠো চাল। একটু ভাতের ফেনের জন্যে উলঙ্গ-জীর্ণদেহী নারী-পুরুষ ভিক্ষা করে বেড়ায় বাড়ি-বাড়ি গিয়ে, ভেতো বাঙালি কীভাবে অভাবের তাড়নায় ভাত ছেড়ে কচু, মেটে আলু, জংলি শাক খেতে শুরু করে, সেটাও জোটাতে না পেরে যোগাড় করে গুগলি, শামুক, ঝিনুক খায়— তার হৃদয়গ্রাহী বিবরণ আমরা পাই এ লেখায়। উপন্যাসটি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে, যখন আমরা দেখি, ভাতের জন্য কাপালীদের ছোট বউ নিজের শরীর বিকিয়ে দেয় পরপুরুষের কাছে। এভাবেই উপন্যাসটিতে পাঠক দুর্ভিক্ষের জীবন্ত এবং সর্বগ্রাসী রাক্ষসরূপ দেখতে পান, মনুষ্যত্বের অন্তঃস্থল থেকে— সংবেদনশীল ও মানবিক মানুষের হৃদয়ে যা হাহাকার জাগাতে বাধ্য।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী ১৯৪৩-এর মন্বন্তরে বাংলার অন্তত ৩৫ লক্ষ নরনারী ও শিশু মৃত্যুবরণ করেন। বেসরকারি হিসাবে এই সংখ্যা ৫০ লক্ষও হতে পারে।[১] ১৯৪৩ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর জনযুদ্ধের প্রথম পাতায় অনাহারে মৃত্যুর একটি হিসেব দেওয়া হয়। হিসেবটি হল— মৃতের সংখ্যা কলকাতায় ৬৮২, ঢাকায় ৩৬৫, ফরিদপুরে ২২২, বরিশালে ১২৫, চাঁদপুরে ১০০, ময়মনসিংহে ৬০। সমস্ত জেলা মিলিয়ে ১ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংখ্যা দাঁড়ায় ২,০৭০ জন।[২] যাঁরা মারা যান তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন কৃষি শ্রমিক, ভাগ-চাষি, দরিদ্র কৃষক ও শহর নগরের নিম্নবিত্ত মানুষ। ৬০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে ৩০ লক্ষ পরিবার নিঃশেষ হয়ে যায়; যাদের উপার্জন করার মত কেউ ছিল না। ১০ লক্ষ বাঙালি গৃহহারা হয়। শতকরা প্রায় ২৫ জন চাষি জমি হারায়।[৩]

না খেতে পেয়ে দলে দলে নিরন্ন মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে চলে আসতে থাকেন এবং বুভুক্ষ মানুষদের মৃত অবস্থায় শহরের রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। মধ্যরাত্রে আর্তনাদ শোনা যেত 'মাগো একটু ফ্যান দাও'।[৪] গ্রামীণ মানুষেরা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 574 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নিজেদের গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে ফুটপাতে আশ্রয় নেন। ফুটপাতে বসবাসকারী গ্রামীণ মানুষদের এই দুর্দশা, অসম্মান সকলকেই নাড়া দেয়। মহিলা নেত্রী মণিকুন্তলা সেন 'সেদিনের কথা' গ্রন্থে লিখেছেন— "অন্নের জন্মদাতা কৃষকের কণ্ঠে 'ফেন দাও' কান্নাটা বড়ো বিসদৃশ লেগেছিল।"[৫] মহিলা নেত্রী রেণু চক্রবর্তী লিখেছেন—

> "কাতারে কাতারে মানুষ, একদিন যারা জমি চষেছে, ফসল ফলিয়েছে, অন্নদান করেছে বাংলার মানুষকে, তারা আজ অন্নহীন— গ্রামে এক দানা চাল নেই— বুভুক্ষায়, ভয়ে, ত্রাসে তারা চলেছে শহরের দিকে। আশ্রয় নিয়েছে ফুটপাতে; আবর্জনা ঘেঁটে অখাদ্য খেয়েছে, ফ্যানের জন্য আর্তনাদ করেছে— তারপর ধীরে ধীরে দেহের শক্তি নিঃশেষ হয়েছে এবং রাস্তারই ধারে কত বাড়ির দরজার সামনে তারা চিরনিদ্রায় ঢলে পড়েছে।"[৬]

দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি ক্ষুধার হাত থেকে পরিবারকে বাঁচাতে কৃষক মেয়ে-বউরা তাদের ইজ্জত বিক্রি করতে বাধ্য হন। আগেও দুর্ভিক্ষ-মহামারি এসেছে। কিন্তু মেয়েদের ইজ্জত এর আগে এমনভাবে নষ্ট হয়নি। বিদেশি সৈন্যদের জন্য দালালদের মারফতে একখানা শাড়ি বা একদিনের খাবারের বিনিময়ে এইসব 'সস্তা' মেয়েদের বাজারও জমে উঠল।[৭] একদিকে ক্ষুধার্ত নরনারী ও শিশুদের রক্ষা করা, অন্যদিকে নারীদের সম্মান বাঁচানো মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক গণসংগঠনের ভিত্তি প্রস্তুত করে।

এই সময় দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে দিতে কমিউনিস্ট পার্টি তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলাদেশে ত্রাণের কাজ সংগঠিত করেন। ফলে কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা কর্মীদের উদ্যোগে ১৯৪২ খ্রিঃ ১৩ এপ্রিল কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট লাইব্রেরি হলে মহিলাদের একটি ফ্যাসিবিরোধী সভা ডাকা হয়। এই সভায় বামপন্থী মহিলারা ছাড়াও বিভিন্ন দলমত ও প্রগতিশীল মহিলারা যোগ দেন। এই সভা থেকে একটি 'কলকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সংগঠন সমিতি' (Calcutta Women's Self-Defence League) গঠিত হয়। এই সংগঠন সমিতির আহ্বায়িকা ছিলেন এলা রীড। কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন— জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, সাকিনা বেগম, রেণু চক্রবর্তী, সুধা রায়, মণিকুন্তলা সেন, নাজিমুন্নেসা আহমেদ, বিয়াট্রিস টেরান, অপর্ণা সেন, ফুলরেণু দত্ত (গুহ) প্রমুখ। এই সমিতির প্রধান কর্মসূচি ছিল— ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা, বাস্তুহীন ব্যক্তিদের বাসস্থান-সহ খাদ্য-বস্ত্র-অর্থ সংগ্রহ করা, ন্যায্য মূল্যের দোকান চালানো, শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েদের নিয়ে একটি আত্মরক্ষা বাহিনী গঠন, ফসল বাড়াও ও উৎপাদন বাড়াও আন্দোলনে সহযোগিতা করা।[৮] মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে তোলার কাজ শুরু হয় গ্রামে ও শহরে। সমিতি গড়ার কর্মসূচি নিয়ে মহিলা কর্মীরা ছড়িয়ে পড়েন কলকাতার বস্তি ও মধ্যবিত্ত অঞ্চলে, বিভিন্ন জেলার গ্রাম শহরের অঞ্চলে অঞ্চলে।

হাজার হাজার নারী শিশুকে বাঁচাবার জন্য মহিলারা তিনটি পর্যায়ে কাজ শুরু করেন। প্রথম পর্যায়ের আন্দোলন ছিল মজুতদারদের চোরাকারবারিদের চিহ্নিত করে খাদ্য সামগ্রী বণ্টন এবং সরকারকে চাপ দেওয়া। এই আন্দোলন সবচেয়ে ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করে ঢাকা, ময়মনসিংহ, বর্ধমান, রংপুর, পাবনা, বরিশাল, দিনাজপুর, কলকাতা ও ২৪ পরগণা জেলায়।[৯] কমিউনিস্ট নেতৃত্ব এই সময় আহ্বান জানান—

> "দুর্গতজনের পাশে দাঁড়াও। দুর্ভিক্ষপীড়িত নারী ও শিশুদের বাঁচাও। চোরাবাজারির বিরুদ্ধে আন্দোলন কর। নিরন্নকে অন্ন দিতে সরকারকে বাধ্য কর।"[১০]

এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মহিলারা বিভিন্ন জায়গায় নিরলসভাবে কাজ করতে আরম্ভ করেন। কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় ত্রাণ কাজে সহায়তা করার জন্য ন্যায্য মূল্যের দোকানে লাইনে দাঁড়ানো, দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্য করতে এগিয়ে যান মহিলারা। স্বেচ্ছাসেবিকারা গিয়ে ক্রেতাদের সাহায্য করতেন এবং মহিলা ক্রেতারা যাতে বিধিমত জিনিস পান সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। পর্দাসীন মধ্যবিত্ত মহিলাদের পাশাপাশি বস্তির মেয়েরাও এই কাজে যোগ দেন।[১১] কলকাতার গড়িয়াহাট অঞ্চলে এমনই একটি সস্তা চালের দোকান খোলা হয়েছিল।

রেশনের দোকানের সামনে লম্বা লাইন পড়লে অসাধু দোকানিরা অনেক সময় ক্রেতাদের সাথে খারাপ ব্যবহার এমনকি মারধরও করত। রাত তিনটের থেকে মেয়েদের লাইনে দাঁড় করানো এবং সকালে দোকান খুললে এক এক করে চাল পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন মহিলা কর্মীরা। নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে কেউ না কেউ লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 574 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

থাকতেন। অল্পবয়সী মেয়েদের দালালদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সারারাত তাদের পাহারা দিতেন মহিলা কর্মীরা। কেউ লাইনে দাঁড়িয়ে সন্তান প্রসব করলে তার ব্যবস্থা করা, কেউ মরা শিশু কোলে নিয়ে বসে আছে তা সত্ত্বেও লাইন ছাড়ছে না— তারও ব্যবস্থা করা— এরকম অজস্র কাজ দিনরাত করে যান মহিলারা।[১২]

খাদ্য সংকট দূর করার জন্য কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় ও বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন দলমত সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে সংযুক্ত খাদ্য কমিটি, জনরক্ষা কমিটি গড়ে উঠতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে খাদ্য সম্মেলন হয়। খাদ্য সরবরাহ ও বন্টনের জন্য প্রায় ১০০ জন মহিলাকে নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে ওঠে। তাঁরা ১৫ থেকে ১৬টি দোকানে লাইনে দাঁড়ানো মেয়েদের সাহায্য করতেন। ১৯৪৩ খ্রিঃ ২৪ জানুয়ারি জনরক্ষা সমিতির ডাকে টাউন হলে এক খাদ্য সম্মেলন হয় যেখানে মধ্যবিত্ত ও বস্তিবাসী হিন্দু-মুসলমান মহিলারা যোগ দেন।[১৩] সম্মেলনে রেশনিং ব্যবস্থা ও বাঁধাদরের দোকান খোলার দাবি জানানো হয়। বাঁধাদরের চালের দোকান খোলার দাবি জানিয়ে ৬ হাজার সই সংবলিত একটি দাবিপত্রসহ সমিতি সরকারের কাছে ডেপুটেশন দেয় এবং অবিলম্বে এরূপ দোকান খোলার দাবি জানানো হয়। সারা বাংলায় জেলায় জেলায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ও জনরক্ষা সমিতির মহিলারা যুগ্মভাবে খাদ্য আন্দোলনে কাজ করতে থাকেন।[১৪]

কিন্তু খাদ্য সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকলে সরকারের উপর চাপ দেওয়ার জন্য 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' এবং 'মুসলিম মহিলা আত্মরক্ষা লীগ' যুগ্মভাবে ভুখা মিছিল করে আইনসভা অভিযানের সিদ্ধান্ত নেন।[১৫] ১৯৪৩ খ্রিঃ ১৭ মার্চ কলকাতার বস্তিবাসী এবং শহরতলির দরিদ্র অনশনক্লিষ্ট ক্ষুধার্ত প্রায় ৫০০০ হিন্দু-মুসলমান মহিলা খাদ্যের দাবিতে এবং জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানাতে মিছিল করে আইনসভা ঘেরাও করেন। এই প্রথম মহিলাদের নেতৃত্বে আইনসভা ঘেরাও হল। এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন— মণিকুন্তলা সেন, রেণু চক্রবর্তী, এলা রীড, গীতা মল্লিক, কমলা মুখার্জী প্রমুখ। মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হকের কাছে মহিলারা দাবি তোলেন—

> "আমরা ভিক্ষা চাইতে আসিনি। আমরা যে দামে চাল কিনতাম সেই দামে চাল দিন। আমরা কিনে নেব।"[১৬]

ফজলুল হক তাঁর অক্ষমতা জানালেও মহিলারা তাদের দাবি থেকে না সরায় তিনি একশ বস্তা চাল মহিলাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে বলেন।[১৭] প্রত্যেকে ২ সের করে চাল পান। মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন তিনি এবার থেকে একবেলা আহার করবেন। মনিকুন্তলা সেন লিখেছেন—

> "কলকাতা শহরের উপর এই নতুন ধরনের একটি ঘটনার কোনও সংবাদ বা ছবি পরের দিনের প্রভাতি কাগজগুলির একটিতেও দেখা গেল না। অথচ সংবাদদাতারা অনেক ছবি তুলেছিলেন ও বিবরণীও নিয়েছিলেন।"[১৮]

অথচ বিদেশি কাগজে ছবিসহ খবরটি প্রকাশিত হয়।

এই আইনসভা অভিযান ছিল মহিলাদের প্রথমতম যৌথ আন্দোলন যা মধ্যবিত্তদের স্তর অতিক্রম করে শ্রমজীবী নারীদের স্তর পর্যন্ত পৌঁছাল। এই আন্দোলনের চাপে প্রতিশ্রুতি মতো কলকাতায় ১৬টা ন্যায্য দরের দোকান খোলা হয়।[১৯] কলকাতার বস্তি অঞ্চলে শুধু মহিলাদের জন্যই ৮টি বাঁধা দরের দোকান খোলা হয়।[২০] এছাড়া সরকার থেকে কয়েকটি বড়ো ক্যান্টিনও খোলা হয়— যেখান থেকে পাড়ার ক্যান্টিনগুলোতে খিচুড়ি পাঠানো হত।[২১] মহিলা নেত্রী রেণু চক্রবর্তী, মণিকুন্তলা সেন প্রমুখ মনে করেন যে, এই ধরনের আন্দোলনের ফলেই কলকাতায় বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা চালু হয়।

উক্ত মিছিলে অনুপ্রাণিত হয়ে নানা স্থানে ভুখা মিছিল সংগঠিত করতে থাকেন মহিলা নেতৃত্বরা। ১৯৪৩ সালের ১০ মার্চ বাঁকুড়ায় শ-চারেক মহিলা, রেশন দোকানের দাবিতে ভুখা মিছিল করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যান। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে পাবনার ৬০০ মহিলা, ১৯৪৩ সালের ২৫শ মার্চ ফরিদপুর জেলার মাদারিপুরে ২,০০০ মহিলা খাদ্যের দাবিতে মিছিল করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যান। জলপাইগুড়ি জেলার কালিয়াগঞ্জ বাজারে ব্যবসায়ীরা ধানের দাম বৃদ্ধি করলে কৃষক মহিলারা জোটবদ্ধ হয়ে পুরানো দামেই ধান বিক্রি করতে ব্যবসায়ীদের বাধ্য করেন।[২২] ১৯৪৩ সালের জুন মাসে মেদিনীপুরের তমলুক থানার দুই নম্বর ইউনিয়নের দুইশত হিন্দু ও মুসলিম মহিলা কোলাঘাট, রূপনারায়নপুর ধানকলে যান এবং ১০

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 574 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

টাকা মণ দরে চাল বিক্রির দাবি জানান। এইভাবে সবস্তরের মহিলারা জোটবদ্ধ হয়ে জনগণকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন।[২৩]

মহিলাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ ছিল দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের মধ্যে খাদ্য বিতরণের জন্য বিভিন্ন জায়গায় লঙ্গরখানা খোলা। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে সকলকে একযোগে টাকা তুলে চাল সংগ্রহ করে লঙ্গরখানা খোলার আহ্বান জানান হয়।[২৪] ফলে, প্রচার, আন্দোলন, সরকারের উপর চাপ দেওয়ার পাশাপাশি চলতে থাকে সর্বত্র সর্বদলীয় খাদ্য কমিটি, অসংখ্য রিলিফ কমিটি, লঙ্গরখানা, খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ, ওষুধ সংগ্রহের ও বিতরণের অসংখ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা।[২৫] মহিলা কর্মীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল, ডাল প্রভৃতি যোগাড় করে খিচুড়ি বা রান্না করা খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন।[২৬] দুর্ভিক্ষের প্রভাব যেহেতু কলকাতায় বেশি ছিল তাই উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতায় ১৭টি খিচুড়ি বিতরণ কেন্দ্র খোলা হয়।[২৭] এছাড়া শিশুদের জন্য দুধ বিতরণ কেন্দ্র খোলা হয় ৮টি।[২৮] এই কেন্দ্রগুলি থেকে বিনামূল্যে কাপড়, ওষুধ বিলি করা হত।[২৯]

বর্ধমান শহরেও এই সময় অনেকগুলি লঙ্গরখানা চালানো হয়। তাছাড়া, শিশুদের জন্য পাড়ায় পাড়ায় পাউডার মিল্ক গরম জলে গুলে বিতরণ করা হয়। এগুলি প্রধানত মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মেয়েরা চালাতেন। যাঁদের মধ্যে কয়েকজন কমিউনিস্ট মহিলা নেতৃত্ব ছিলেন উল্লেখযোগ্য। যেমন— শিবরাণী মুখার্জী, ভারতী দেবী, রেণু অধিকারী, রেণু ঘোষ, নির্মলা রায়, জ্যোৎস্না সেনগুপ্ত, রাবেয়া, সামশুন্নেসা, বিভা কোঙার, শেফালী চৌধুরী প্রমুখ।[৩০] হুগলি জেলাতেও দুর্ভিক্ষপীড়িত ও দুঃস্থ মেয়েদের সাহায্যের জন্য জেলার বহুস্থানে কেন্দ্র গঠন করা হয় প্রধানত কমিউনিস্ট মহিলা কর্মীদের দ্বারা— যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুক্তা কুমার, সন্ধ্যা চ্যাটার্জী, প্রতিভা গাঙ্গুলী প্রমুখ। কেন্দ্রগুলির মধ্যে হুগলির কেন্দ্র, বুড়া শিবতলার কেন্দ্র, গড়বাটির কেন্দ্র, চন্দননগরের কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য।[৩১] এছাড়া, বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, খুলনা, নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ি, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, মেদিনীপুর, হাওড়া, নদিয়া, চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি জেলাগুলিতেও খাদ্য ও দুধ বিতরণের জন্য কেন্দ্র খোলা হয় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে।[৩২]

ভিন্ন জায়গায় লঙ্গরখানা খোলার পাশাপাশি রিলিফের কাজের জন্য গড়ে উঠে 'বেঙ্গল উইমেন্স ফুড কমিটি'। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে আরো ১৪টি মহিলা সংগঠন মিলে এটি গঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল দুঃস্থদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ ও অর্থ সংগ্রহ করা। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই কমিটি রিলিফের জন্য ৭৫,০০০ টাকা সংগ্রহ করে।[৩৩] এই কাজে গরিব, মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলারা ছাড়াও অনেক অভিজাত ঘরের মহিলা এগিয়ে আসেন।[৩৪]

লঙ্গরখানা খোলার পাশাপাশি আত্মরক্ষা সমিতি সাহায্যের জন্য ভারতের সর্বত্র এবং ভারতের বাইরে আবেদন জানায়। ১৯৪৩ খ্রিঃ ২০ ডিসেম্বর 'CALL TO WOMEN' নামে একটি পুস্তিকায় দুর্ভিক্ষের ছবিসহ করুণ কাহিনি বর্ণনা করে সাহায্যের জন্য আবেদন করা হয়।[৩৫] এই সময় ক্ষুধিতের সেবায় সাহায্য প্রেরণের আবেদন জানিয়ে জনযুদ্ধের পাতায় বহুবিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ একাধিক বিবৃতি প্রকাশিত হয়।[৩৬] এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আত্মরক্ষা সমিতির কাছে যে সাহায্য এসেছিল তার একটা হিসাব এলা রিড দিয়েছিলেন। এতে দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তিগতভাবে এবং বিভিন্ন সংগঠন থেকে নানা সাহায্য এসেছিল। যেমন ব্যক্তিগতভাবে শ্রীমতী রেবা সরকার শিশুদের ১০০টি পোশাক, পাটনা থেকে শ্রীমতী নীলিমা ঘোষাল ৫০টি কুর্তি, শ্রীমতী অমলা দত্ত ৫০টি নতুন গেঞ্জি সাহায্য করেন। এছাড়া পাঞ্জাব সেবা সমিতি ৫০টি শিশুদের পোশাক, আহমেদাবাদের নারী সমিতি ৬০০টি কাপড়, মিরাট নারী সমিতি ৪০টি কাপড় প্রেরণ করেন। এছাড়া উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন এলাকার নারী সংগঠন থেকে গরম জামা-কাপড়, শিশুদের পোশাক প্রেরণ করা হয়।[৩৭] বোম্বাইয়ের মহিলা সমিতি এক টাকার একটি দুর্ভিক্ষ রিলিফ তহবিল খোলে। কোটার মহিলা লীগ আড়াই হাজার টাকা সংগ্রহ করে। এই সংবাদ জনযুদ্ধের পাতায় প্রকাশিত হয়।[৩৮] বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নানা মহিলা সংগঠন যেমন— গুজরাট মহিলা সংঘ, গুন্টুর মহিলা সমিতি, মাদ্রাজ মহিলা সংঘ, বেনারস মহিলা সমিতি প্রভৃতি নারী সংগঠনগুলি সাহায্য পাঠায়।[৩৯] বিদেশ থেকেও সাহায্য আসতে থাকে। ১৯৪৩ সালের ২৬শে নভেম্বর 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, সোভিয়েত সরকার ব্রিটিশ সরকারকে জানায় যে, তারা ভারতের জন্য চাল পাঠাবেন।[৪০] বাংলার খাদ্য সঙ্কট সমাধানের দাবিতে ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক পত্রিকা 'ডেলি ওয়ার্ক'-এ বিলাতের শ্রমিক শ্রেণি ব্রিটিশ সরকারকে তিনটি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 574 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কাজ করার আবেদন জানায়— (১) বিনামূল্যে দুঃস্থদের খাদ্য বিতরণ, (২) মজুতদারদের খাদ্যশস্য বাজেয়াপ্ত করা, (৩) দঃ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বাড়তি খাদ্য ভারতে পাঠানো।[৪১] এছাড়া চিন, সিংহল প্রভৃতি দেশ থেকেও সাহায্য পাঠানো হয়।[৪২]

দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে মহিলাদের তৃতীয় পর্যায়ের কাজ ছিল নিরাশ্রয় নারী ও অনাথ শিশুদের আশ্রয় দেওয়া অর্থাৎ পুনর্বাসন। শুধু রিলিফের মাধ্যমে একটা জাতিকে বাঁচানো যাবে না — একথা উপলব্ধি করে কমিউনিস্ট মহিলা কর্মীরা উদ্যোগ নিয়ে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মাধ্যমে ১৯৪৩-৪৪ খ্রিঃ মধ্যে কলকাতা ও বিভিন্ন জেলায় অন্তত ১০০টি কুটির শিল্প কেন্দ্র গড়ে তোলেন। উদ্দেশ্য ছিল দুঃস্থ মেয়েরা যাতে হাতের কাজ করে কিছুটা উপার্জন করতে পারে তারই প্রচেষ্টা। এই কেন্দ্রগুলিতে কাপড়ের পুতুল, খেলনা, দড়ির পাপোশ, মাথার ফিতা, জাল বোনা, ঠোঙ্গা তৈরি, চটের থলি তৈরি, পাড়ের সুতোর আসন তৈরি, বেতের মোড়া, ঝুড়ি, টেবিল ঢাকা ইত্যাদি সূচী শিল্পের কাজ, ডালা-কুলো তৈরি, সাজি, মাদুর তৈরির কাজ, তাঁত ও চরকা চালানোর কাজ, ডালের বড়ি, জ্যাম-জেলি তৈরি প্রভৃতি নানারকম হাতের কাজ শেখানো হত।[৪৩] কোথাও কোথাও কাগজ তৈরির কেন্দ্রও খোলা হয়। যেমন কলকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সরকারি শিল্প বিভাগের সাহায্যে ১৩ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে লি মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের অধ্যক্ষা মিসেস গ্রিফিত-এর বাড়িতে একটি কাগজ তৈরি শেখার কেন্দ্র খোলে।[৪৪] প্রায় একই সময়ে কলকাতা মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির দপ্তর বউবাজারে সরকারি শিল্প বিভাগের সাহায্যে কাগজ তৈরি শেখার কেন্দ্র খোলা হয়।[৪৫] ১৯৪৪ খ্রিঃ ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস নেত্রী সরোজিনী নাইডু কলকাতার এই কাগজ তৈরির কেন্দ্রটি দেখে উচ্চপ্রশংসা করেছিলেন।[৪৬] জাতীয় কংগ্রেস নেত্রী নেলী সেনগুপ্তা মন্বন্তরে কমিউনিস্টদের, নারী সমিতি এবং অন্যান্য রিলিফ সংগঠনের কাজ দেখে খুবই প্রশংসা করেন।[৪৭]

১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রাদেশিক মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি কলকাতা ও বিভিন্ন জেলার মহিলাদের হাতের তৈরি কাজের একটি প্রদর্শনী সংগঠিত করে কলকাতায়। প্রদর্শনীটি হয় কর্পোরেশনের একটি স্কুলে। বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রে এবং শিল্পকেন্দ্রে তৈরি জিনিস দেখানো এবং বিক্রি হয়। প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের শ্রীমতী শামসুন নাহার।[৪৮] অনুরূপভাবে বউবাজারের কাছাকাছি একটি তাঁত কেন্দ্রও খোলা হয়। এই কেন্দ্রটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন কমিউনিস্ট নেত্রী পঙ্কজ আচার্য, বেলা লাহিড়ী ও নৃত্য শিল্পী পলি রায়ের মা অনিমা রায়।[৪৯]

জেলায় জেলায় মহিলা সমিতিগুলি নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে টাকা তুলে দুঃস্থ মহিলাদের আশ্রয় ও শিশুদের লালন পালনের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন করে। চট্টগ্রামে পাঁচটি আশ্রয় কেন্দ্রে ১৫০ জন, ঢাকায় তিনটি কেন্দ্রে প্রত্যেকটিতে ২০ থেকে ২৫ জন মহিলা আশ্রয় পান। বাঁকুড়াতে একটি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন একটি শিশু কেন্দ্র খোলে। এখানে ৭০টি শিশু থাকত। সবচেয়ে বেশি পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ে উঠে ফরিদপুরে। স্থানীয় মহিলা সংগঠনগুলি, জনরক্ষা সমিতি, ফ্রেন্ডস অ্যাম্বুলেন্স ইউনিট, সংযুক্ত ফুড কমিটি এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায় ২৪ পরগণার জয়নগরে একটি আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়। এখানে ২০ জন মহিলা আশ্রয় পান। বারাসতে একটি কেন্দ্রে ৭০ জন মহিলা স্থান পান। প্রয়োজনের তুলনায় তা যৎসামান্য হলেও নারীদের উপার্জন ও আত্মনির্ভরতার জন্য এই প্রচেষ্টার সামাজিক মূল্য ও তাৎপর্য ছিল অনেকখানি।[৫০]

১৩৫০ বঙ্গাব্দের ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে তার দোসর হিসাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে মহামারি। 'দুর্ভিক্ষ আর মহামারি এই নিয়ে ঘর করি' — বাংলার ঘরে ঘরে এই চিত্র ফুটে উঠল।[৫১] অনাহারের সঙ্গে প্রথমেই দেখা দিল ম্যালেরিয়া তারপর কলেরা, বসন্ত, শোথ প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি। ১৯৪৪-এর জানুয়ারিতে এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১১০০ গ্রামের মধ্যে ৭০০ গ্রামই ম্যালেরিয়া মহামারিতে আক্রান্ত ছিল।[৫২] আবার ১৯৪৩-এর মাঝামাঝি সময়ে বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি ও মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যার কবলে পড়ে। দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও বন্যার মোকাবিলা করার জন্য ১৯৪৩ খ্রিঃ ২৯ সেপ্টেম্বর কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির পক্ষে মুজফ্ফর আহমেদের উদ্যোগে ভারত সভা হলে বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় পিপলস রিলিফ কমিটি (PRC)। এই কমিটিতে মহিলা সমিতির পক্ষে ছিলেন এলা রীড, মণিকুন্তলা সেন, কনক মুখার্জী, কমলা চ্যাটার্জী, জ্যোতি দেবী প্রমুখ।[৫৩] PRC-এর কাজ ছিল ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে ডাক্তার নিয়ে গিয়ে গ্রামে গ্রামে সাহায্য করা। এই কমিটিতে বহুলোক অর্থ ও ঔষধপত্র দান করতেন। মণিকুন্তলা সেন ও অন্যান্যরা মিলে একটা শো করে রিলিফের টাকা তুলেছিলেন।[৫৪] কিন্তু সারা বাংলায় ক্ষুধা ও ব্যাধি একমাত্র পিপলস

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 574 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রিলিফ কমিটির চেষ্টায় দূর করা সম্ভব নয় দেখে ১৯৪৪ সালের প্রথমেই পিপলস রিলিফ কমিটি-সহ ১৮টি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে সভাপতি এবং অধ্যাপক কে. পি. চট্টোপাধ্যায়কে সম্পাদক করে গঠিত হল 'বেঙ্গল মেডিকেল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটি' (BMRCC)।[৫৫] এই কমিটির মধ্যে থেকে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি তাদের সাহায্যে জেলাগুলিতে মেডিক্যাল রিলিফ পাঠানোর ব্যবস্থা করে। কয়েকটি জেলায় নারী ও শিশুদের চিকিৎসার জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি স্থানীয় ডাক্তারদের সহযোগিতায় ক্লিনিক খোলে। কলকাতায় বিভিন্ন বস্তি অঞ্চলে টাইফয়েড ও বসন্তের টিকা দেবার জন্য অনেক মহিলা ভলান্টিয়ারকে ট্রেনিং দেওয়া হয়। তাঁরা দিবারাত্রি পরিশ্রম করে মহামারি প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার জন্য কাজ করতে থাকেন।[৫৬] এই সময় শুধু কলকাতাতেই তিনটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৪৫ সাল নাগাদ চট্টগ্রাম নারী সমিতি নিজেদের চেষ্টায় দুঃস্থ শিশুদের জন্য একটা হাসপাতাল স্থাপন করে। সমস্ত পূর্ব ভারতে এটি ছিল দুঃস্থ শিশুদের সেবায় নিয়োজিত একমাত্র হাসপাতাল। ১২১ নং বউবাজার স্ট্রিটের দোতলায় দশটি বেড নিয়ে মুজফ্‌ফর আহমদের উদ্যোগে 'রেড এড কিওর হোম' নামে একটি নার্সিংহোম খোলা হয়। এই হোমের দেখাশোনার প্রধান দায়িত্বে ছিলেন চট্টগ্রামের জ্যোতি দেবী।[৫৭]

১৯৪৪ সালের ৫ এপ্রিল 'জনযুদ্ধে' প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি অন্যান্য মহিলা ও রিলিফ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'নারী সেবা সংঘ' নামে একটি স্থায়ী সংগঠন গড়ে তোলে।[৫৮] উদ্দেশ্য ছিল নিরাশ্রয় মেয়েদের আশ্রয় দানের জন্য হোম তৈরি করা এবং সমাজে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নানারকম শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করা।[৫৯] মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষে কমলা মুখার্জী ও রেণু চক্রবর্তী এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রেণু চক্রবর্তীর মা ব্রহ্মকুমারী রায় প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপা ছিলেন। সীতা চক্রবর্তী ছিলেন সম্পাদিকা। নানা ধরনের হাতের কাজের পাশাপাশি ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা, ভালো ফল করলে অন্য স্কুলে বা নার্সিং শিক্ষার ব্যবস্থা করা, বয়স্কদের শিক্ষার জন্য ক্লাস নেওয়া হত। শিক্ষান্তে অনেক মেয়ে চাকরিও পেতেন। বহুমুখী কাজের এমন প্রতিষ্ঠান ছিল তৎকালীন সময়ে বিরল।[৬০] নারী সেবা সংঘ তাদের তৈরি সামগ্রীর প্রদর্শনী প্রতিবছর করত। এইরকমই একটি প্রদর্শনী হয় প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৯৪৪ খ্রিঃ ডিসেম্বর মাসে, যেখানে আত্মরক্ষা সমিতি, নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন (AIWC) এছাড়াও আরোও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান যোগ দিয়েছিল। সরোজিনী নাইডু এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে এসে মেয়েদের আত্মরক্ষা ও আত্মনির্ভরতার জন্য এই প্রচেষ্টা দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন।[৬১]

১৯৪৪ খ্রিঃ ১০-১৭ জুন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে সারা বাংলায় 'সমাজ জীবনের পুনর্গঠন সপ্তাহ' পালন করা হয়। ১৯৪৪ খ্রিঃ ৩ জুন সমিতির পক্ষ থেকে পুনর্বাসন সপ্তাহের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি সম্বলিত একটি ম্যানিফেস্টো প্রচার করা হয়— যাতে দুঃস্থ ও নিরাশ্রয় নারী ও শিশুদের বাঁচানোর জন্য সর্বস্তরের নারী বিশেষ করে শিক্ষিত নারী সমাজের কাছে আহ্বান জানানো হয়। এই সময় আবার দেখা দেয় বস্ত্র সঙ্কট। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি বিভিন্ন জেলায় 'কাপড় সপ্তাহ'-র একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে সমস্যাটির প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মজুতদারদের গুদাম থেকে কাপড়ের গাঁট বের করে জনগণের মধ্যে বিতরণ করা, কন্ট্রোল দরে কাপড় বিক্রির ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সমিতিও মিলিতভাবে আন্দোলনে সামিল হয়।৬২ ১৯৪৫ সালের ২১ আগস্ট সমিতির নেতৃত্বে কাপড়ের দাবিতে আন্দোলন জোরদার হলে সরকার ঘোষণা করতে বাধ্য হয় ঈদ ও পূজায় ১৫ গজ কাপড় বেশি দেওয়া হবে।[৬৩]

এইভাবে সমাজজীবনে ভাঙ্গন রোধ করার কাজে বাংলার অগ্রণী নারী সমাজ এগিয়ে আসে। এই কাজে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে বিভিন্ন মহিলা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমবেত ভাবে রিলিফ ও সামাজিক পুনর্গঠনের কাজ পরিচালনা করে। আসলে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির মূল চালিকাশক্তি ছিল গ্রাম ও শহরের মধ্যবিত্ত ও গরিব মহিলারা। আর সমিতির অগ্রণী কর্মীদের মধ্যে ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা কর্মীরা। যাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল উপরতলার মেয়েদের সঙ্গে সাধারণ মেয়েদের যোগাযোগ ঘটানো।[৬৪] এখানেই নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের (AIWC) সঙ্গে আত্মরক্ষা সমিতির প্রভেদ গড়ে ওঠে। কনক মুখার্জীর মতে AIWC ছিল সীমাবদ্ধ সমাজ সংস্কারের আদর্শে অভিজাত মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত সংগঠন। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে AIWC সংস্কারমূলক বা সেবামূলক কাজে অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে সমবেতভাবে কাজ করলেও গরিব মহিলাদের সংগঠনের সাথে যুক্ত করা বা কাজ করানোকে তাঁরা পছন্দ করতেন না।[৬৫] অন্যদিকে মহিলা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 574 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আত্মরক্ষা সমিতির শ্রেণি চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই মণিকুন্তলা সেন, রেণু চক্রবর্তীর মতো কমিউনিস্ট নেতৃত্বরা যাঁরা প্রথম পর্বে AIWC-র সদস্যা ছিলেন তাঁরা এই সংগঠনে নীচু তলার মেয়েদের আনার উদ্দেশ্যে সাধারণ সভ্যদের জন্য চার আনা ফি করার প্রস্তাব তুললে, সেই প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। কারণ অনেকেই একে 'কমিউনিস্ট প্লট' বলে অভিহিত করেন। মণিকুন্তলা সেন মনে করেন সংগঠনকে সাধারণ মেয়েদের মধ্যে টেনে নিয়ে গেলে নেতৃত্বের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার ভয়ে সেই দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। যদিও AIWC-র সকল সদস্য কমিউনিস্ট ভীতিতে ভুগতেন না কিন্তু বাংলায় কিছুজন ছিলেন যাঁরা সরোজিনী নাইডু বা রামেশ্বরী নেহরুর উদার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না।[৬৬] তাই নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের সঙ্গে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি একাত্ম হতে পারেনি।

Reference:

১. কনক মুখোপাধ্যায়, 'নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা', কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৫৭
২. সরোজ মুখোপাধ্যায়, 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা', কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৩৪৫
৩. রেণু চক্রবর্তী, 'ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা', কলকাতা, পৃ. ২৭-২৮
৪. নিবেদিতা নাগ, 'ঢাকা থেকে কলকাতা', কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ২৮
৫. মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, 'মণিকুন্তলা সেন জনজাগরণে নারী জাগরণে', কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৬৮
৬. রেণু চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
৭. মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮
৮. কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪
৯. রেণু চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
১০. মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯
১১. রেণু চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮। পুলিশ ফাইল নং- ৭৭৭/৪২ থেকে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কর্মতৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়। পুলিশের রিপোর্টে প্রাপ্ত কয়েকজন উল্লেখযোগ্য সদস্যার নাম হল— মণিকুন্তলা সেন, কমলা মুখার্জী, আশা সামন্ত, ভক্তি ঘোষ, অলকা মজুমদার প্রমুখ।
১২. মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯-৭০
১৩. রেণু চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০
১৪. কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯
১৫. রেণু চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ.২৮-২৯ এবং মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫
১৬. মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫
১৭. পিপলস্ ওয়ার, ৪ এপ্রিল, ১৯৪৩ এবং কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬
১৮. মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১
১৯. মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, তদেব, পৃ. ৭১
২০. কনক মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬
২১. মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১
২২. রেণু চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০-৩২
২৩. কনক মুখোপাধ্যায়, 'ভারতের নারী আন্দোলনের ধারা', পৃ. ৩৫
২৪. অনিল বিশ্বাস, 'বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন— দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য', প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৩০৭
২৫. কনক মুখোপাধ্যায়, 'নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮
২৬. অসিত ঘোষ, 'আপন কথা', কলকাতা, ২০১১, পৃ. ২০

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 574 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২৭. সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬১। উত্তর কলকাতায় পাঁচটা জায়গায় রিলিফ কেন্দ্র খোলা হয়। ১৩/১ বলরাম ঘোষ স্ট্রিট, ১এ গোপাল মিত্র লেন, ১১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, হরিনাথ দে স্ট্রিট বস্তি ও ৪১ নং বনমালী সরকার স্ট্রিট, কুমারটুলি। মধ্য কলকাতায় চারটি স্থানে খোলা হয়— ২৫ ডিসকন লেন, অখিল মিস্ত্রি লেন, তালতলা ও ৪০ ডি পটারি রোড। দক্ষিণ কলকাতায় ৭টি কেন্দ্র খোলা হয়— ১৬/২ গড়চা বস্তি, ৩ কাঁকুলিয়া বস্তি, ৬১ চারু এভিনিউ, টালিগঞ্জ রোড, ৩৬ টালিগঞ্জ রোড (শাহানগর), ৪ বি ইন্দ্র রায় রোড, ভবানীপুর, ১১ রমানাথ পাল স্ট্রিট, খিদিরপুর এবং ১ নিউ রোড আলিপুর।

২৮. দুধ বিতরণ কেন্দ্র ছিল— ৩৬ নবকৃষ্ণ স্ট্রিট, ২৯ হরিনাথ দে রোড,১৭ দুর্গাচরণ ডাক্তার লেন তালতলা, ১২১ এ বহুবাজার স্ট্রিট, ১৪/৫ গড়িয়াহাট রোড বালিগঞ্জ, ১০ ইন্দ্র রায় রোড ভবানীপুর, ৯৩ হাজরা লেন এবং রাজা বসন্ত রায় রোড।

২৯. শ্যামলী গুপ্ত, ‘নারী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা’, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১১৫

৩০. বিনয় চৌধুরী, ‘অতীতের কথা কিছু অভিজ্ঞতা’, পৃ. ৭৮

৩১. তুষার চট্টোপাধ্যায়, ‘স্বাধীনতা সংগ্রামে হুগলী জেলা’, নবজাতক, ১৯৮৩, পৃ. ১৬৩

৩২. কনক মুখোপাধ্যায়, ‘নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা’, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২। ফরিদপুর জেলার কলারগাঁও দক্ষিণপাড়া মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি একটি দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র খুলে ১৭৫ জন শিশুকে দুধ দেওয়ার ব্যবস্থা করে। মাদারিপুরে মহকুমা হাকিমের সাথে দেখা করে মহিলা সমিতি ওয়ার্ক হাউস-এর ভার নিজেরা নেন। ইদিলাপুরের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ১টি দুধের ও কুইনাইনের কেন্দ্র চালান। বরিশালে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি শিশুদের জন্য ১৩টি দুধ বিলির কেন্দ্র খোলে।

৩৩. কনক মুখোপাধ্যায়, ‘নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা’, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

৩৪. বাংলাকে বাঁচানোর জন্য মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি জেলায় সম্পাদিকা বা সংগঠক হিসাবে দায়িত্ব বণ্টন করে একটি তালিকা এলা রিড প্রকাশ করেছিলেন। কলকাতা— অনিলা দেবী, ২৪ পরগনা— নিবেদিতা নাগ, হাওড়া— প্রীতি লাহিড়ী, হুগলি— প্রতিভা গাঙ্গুলী, বর্ধমান— বিভা কোঙার, যশোহর— চারুবালা রায়, খুলনা— ভানু দেবী, বরিশাল— বীণা সেন, ফরিদপুর— উমা ঘোষ, ঢাকা— হিরণপ্রভা ব্যানার্জী, ময়মনসিংহ— জ্যোৎস্না নিয়োগী, চট্টগ্রাম— আরতি দাস, নোয়াখালি— জ্যোতি দেবী, কুমিল্লা— বীণা ব্যানার্জী, পাবনা— মায়া সান্যাল, রাজশাহী— অনুপমা বাগচী, রংপুর— রেবা রায়, দিনাজপুর— আশা চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি— গায়ত্রী দেবী, বগুড়া— রেণুকা গাঙ্গুলী, মেদিনীপুর— অনুপমা পট্টনায়েক, বীরভূম— সত্যবালা চ্যাটার্জী, বাঁকুড়া— ভক্তি সিংহ, নদিয়া— মঞ্জু চ্যাটার্জী এবং মুর্শিদাবাদ— আরতি রায়।

৩৫. কনক মুখোপাধ্যায়, ‘নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা’, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

৩৬. মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত, ‘বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান’, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, পৃ. ২৮৩-২৮৪। এই আবেদনে যাঁরা স্বাক্ষর করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহিলা নেত্রীরা হলেন— মোহিনী দেবী, ঊর্মিলা দেবী, ইন্দিরা দেবী, লাবণ্য প্রভা দত্ত, মিসেস এলা রীড, লীলা মজুমদার, মিসেস ডি. এম. বসু প্রমুখ।

৩৭. সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৩

৩৮. সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০১

৩৯. কনক মুখোপাধ্যায়, ‘নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা’, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯-৬০

৪০. মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত, ‘বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান’, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, পৃ. ২৮৫

৪১. সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৫

৪২. সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০১

৪৩. কনক মুখোপাধ্যায়, ‘নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা’, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

৪৪. কনক মুখোপাধ্যায়, ‘নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা’, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

৪৫. মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 574 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৪৬. মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬, কনক মুখোপাধ্যায়, 'নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩ এবং রেণু চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯। সরোজিনী নাইডু লিখেছিলেন— "মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে পরিচালিত কাগজ তৈরির প্রতিষ্ঠানটিই প্রথম রিলিফ কেন্দ্র যা আমি এবার দেখলাম। এইরূপ লাভজনক শিল্পে এত নিপুণতার সঙ্গে মেয়েরা কাজ করছে দেখে আমি খুব আনন্দিত। ... সমিতির এইসব বাস্তব কাজ আমি অত্যন্ত প্রশংসার চোখে দেখছি। এর ভিতর দিয়ে মেয়েরা আত্মনির্ভরতা শিখছে— আর তারই ফলে তারা আত্মসম্মান অর্জন করছে।"

৪৭. সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬১

৪৮. রেণু চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫। প্রদর্শনীর শেষের দিন একটি মহিলা সম্মেলন হয়। সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মেয়েদের প্রশংসা করে বলেন— "বাংলাকে বাঁচাতে হলে ৪০,০০০ মেয়ে চাই যারা এমনি করে কাজ করবে।"

৪৯. পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, পঙ্কজ আচার্য নির্বাচিত রচনা, ১৯৮৩, পৃ. ৯ এবং মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬-১১৭

৫০. রেণু চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯-৫২

৫১. মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০

৫২. রেণু চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯-৪০, অনিল বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪-২৫৫, মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত, পূর্বোক্ত। ১৯৪৪ সালের ৩০ জানুয়ারি কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক চিঠি নং-১/৪৪-এ মহামারিতে আক্রান্ত মানুষদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জে ৫০ হাজার লোক মারা গিয়েছে। ময়মনসিংহ জেলায় ৪৫ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ মহকুমায় ১ লাখেরও অধিক লোক মহামারিতে মারা গেছে। চাটগাঁ জেলায় ১৫ লক্ষের বেশি শয্যাশায়ী এবং দৈনিক মৃত্যুর হার ১০০০-এর বেশি। যশোহরে ১২ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত। হুগলি, মেদিনীপুর, রংপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় ম্যালেরিয়া, কলেরা, শোথ মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এই হিসাব থেকে পরিষ্কার যে, দুর্ভিক্ষের চেয়েও মহামারির কবলে পড়ে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাছাড়া, রোগ ও মহামারিতে শিশু মৃত্যুর হার অনেক বেশি। সর্বোপরি রোগ ও অনাহারে মেয়েদের সন্তান ধারণের শক্তিও নষ্ট হয়ে যায়।

৫৩. সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৪-৩৭৫

৫৪. মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০-১১১

৫৫. জ্যোতি বসু, 'যতদূর মনে পড়ে', এন.বি.এ, ১৯৯৮, পৃ. ১৫, রেণু চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০, কনক মুখোপাধ্যায়, 'নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৫৬. কনক মুখোপাধ্যায়, 'নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৫৭. সরোজ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৫, ৩৮৮-৩৯০, মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ.৩০৬-৩১০, মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

৫৮. নারী সেবা সংঘের কর্মসূচি হল— (ক) দুঃস্থ ও পতিতা নারীদের পুনরুদ্ধার, (খ) শিশুদের পুনরুদ্ধার, (গ) তাদের সাধারণ ও কার্যকরী শিক্ষাদান, (ঘ) তাদের সমাজের প্রয়োজনীয় অংশ রূপে গড়ে তোলা, (ঙ) তাদের দুঃস্থ জীবনের গ্লানি, রোগ ও বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা।

৫৯. নারী সেবা সংঘ গড়ে ওঠে যে ১৮টি গণসংগঠনের সম্মিলিত প্রয়াসে সেগুলি হল— মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ইয়ং উইমেন্স ক্রিশ্চান অ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল উইমেন্স ফুড কমিটি, কলকাতা রিলিফ কমিটি, সার্ভেন্টস অব ইন্ডিয়া সোসাইটি, হিন্দু মহাসভা, পিপলস রিলিফ কমিটি, হিন্দু মিশন, কলকাতা ভিজিলেন্স অ্যাসোসিয়েশন, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি কাউন্সিল অব উইমেন্স, মহারাষ্ট্র ভগিনী সমাজ, ফ্রেন্ডস অ্যাম্বুলেন্স ইউনিট, অল বেঙ্গল ফুড অ্যান্ড ফেমিন রিলিফ কমিটি, রামকৃষ্ণ মিশন, নারী শিক্ষা সমিতি প্রভৃতি।

৬০. মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১-১১২

৬১. রেণু চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯, কনক মুখোপাধ্যায়, 'নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩, মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 65
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 574 - 585
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৬২. কনক মুখোপাধ্যায়, 'নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪
৬৩. শ্যামলী গুপ্ত, 'নারী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা', কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১১৫
৬৪. মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭
৬৫. কনক, মুখোপাধ্যায়, 'নারী মুক্তি আন্দোলন ও আমরা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২
৬৬. মণিকুন্তলা সেন শতবার্ষিকী কমিটি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭